উপসংহার

সময়ের অব্যাহত গতিতে জীবনের যাত্রাও অন্তহীন। সময়ের পালাবদলের সঙ্গে জীবনের ক্ষেত্রেও এসেছে পরিবর্তন। মানব জীবনের বাস্তব পটভূমিকে আধার করে আধুনিক যুগে সাহিত্যিক সন্দর্ভের অগ্রগতি হয়েছে। উপন্যাস বিশেষত মানব-জীবনের ধারক ও বাহক রূপেই অভিহিত। মধ্যযুগীয় দেব-দেবী নির্ভর মঙ্গলকাব্য, গাথা প্রভৃতিকে অতিক্রম করে উপন্যাসের যাত্রা এগিয়ে গেছে মানুষের কাছে। উপন্যাস বাস্তব জীবন সম্পর্কিত এবং মানুষের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, সংগ্রামের কথা বলেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই উপন্যাসের সার্থক যাত্রারম্ভ সূচিত হয়েছিল যা পরিবর্তিত মূল্যবোধে ও বিষয়বিন্যাসে আজও অব্যাহত। যুগের সঙ্গে মানুষের জীবনধারা, দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টেছে। এর প্রভাব উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে পড়েছে। বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উপন্যাসের ধারায় আমরা আত্মজৈবনিক উপন্যাসে সমৃদ্ধ উপন্যাসের একটি রূপ লক্ষ করেছি।

প্রবহমান সময়ের পরিবর্তিত সময়-সমাজ ও মানবিক মূল্যবোধে উপন্যাসের বিষয়বিন্যাসে ও রচনাশৈলীতে ধাপে ধাপে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র হয়ে কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি গোষ্ঠী পর্যন্ত পরিবর্তন রেখার একটা ধারাবাহিকতা লক্ষণীয়। তারপরও নিজস্ব স্বতন্ত্রতায়, সময়ের দাবিতে, নতুন মূল্যবোধে, সচেতন লেখকদের নৈতিক দায়িত্ববোধে অব্যাহত রয়েছে নিত্য নতুন বিষয়বিন্যাস ও রচনাশৈলীর ব্যবহার।

আত্মজৈবনিক উপন্যাস মূলত আত্মজীবনের উপকরণকে কেন্দ্র করেই ব্যক্ত হয়। আর আত্মজীবনেই আমরা ব্যক্তি বা লেখকের পরিচয়কে অর্থাৎ তাঁর আত্মপরিচয়কে অনুভব করি। আত্মপরিচয় প্রত্যেক খ্যাত-অখ্যাত, ছোট-বড় মানুষের পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই গড়ে ওঠে। সেটা রাম, শ্যাম যে-কোনও নামকে কেন্দ্র করেই হোক না কেন। কিন্তু তার হয়ে ওঠার পথে কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুণে সে নিজস্ব পরিচয়ে একটা স্বতন্ত্রতা অর্জন করে। আর এই স্বতন্ত্রতা তার ব্যক্তিত্বকেও উজ্জ্বল করে তোলে। মানুষের অন্তরের নিষ্ঠা ও একাগ্রতা সমসাময়িক জীবন ও জগৎকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি ও নৈতিক মূল্যবোধ তাকে নিজের মধ্যে লিপ্ত না রেখে, সামাজিক দায়বদ্ধতায় দায়িত্বশীল করে তোলে। সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে

তো এই বোধ আরও প্রখর হয়। তার হয়ে ওঠা, নিষ্ঠা, নৈতিক মূল্যবোধ, সমাজ-সচেতনতা তাঁকে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী করে তোলে। জীবনের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণে মানবিক মূল্যবোধগুলোকে তখন একজন সচেতন লেখক কথাবয়নে ভাষার জাদুবলে শৈল্পিক প্রতিবেদনে মূর্ত রূপদান করেন। সমাজ-সচেতন সাহিত্যিক মাত্রেই দূরদর্শী, আর এই দূরদর্শিতার ফলেই তিনি নিজের সমসাময়িক কালে অবস্থান করেও হয়ে উঠেন সর্বদর্শী। তখন তাঁর জীবনদর্শনের অভিব্যক্ত শৈল্পিক প্রতিবেদনটিও কালকে অতিক্রম করে হয়ে ওঠে কালোত্তীর্ণ। তাই আজও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুগেও সচেতন সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তিগুলো সমানভাবে সমাদৃত। কারণ সর্বকালে, সর্বদেশে মানুষের আবেগ-অনুভূতি, ঘাত-সংঘাতময় জীবনের সূক্ষ্ম মানবিক মূল্যবোধগুলো সাহিত্যই বহন করে। দেশ ও কালভেদে মানুষের ভাষা সংস্কৃতি ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু মানবিক অনুভূতি আবেগ-মূল্যবোধ মানব মনে চিরপ্রবাহিত। যার ব্যাপ্তি প্রচ্ছন্নভাবেও মানবিক সম্বন্ধে একটি যুগ থেকে অন্য যুগে, কাল-দেশ ও ভাষার গণ্ডি অতিক্রম করে কোমল স্নিগ্ধ মানবিকবোধের স্পর্শে মানুষকে অভিন্ন করে তোলে। তাই সর্বকালে, সর্বদেশের উপর শুধু 'মানুষ সত্য'। মানুষকে কেন্দ্র করেই যেহেতু সাহিত্যের অভিযাত্রা, তাই সাহিত্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের মধ্যেই খুঁজে ফিরি নিজেকে, অতীত, বর্তমান ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎকেও। সাহিত্য জগৎ ও জীবনের সমগ্রতাকে এত গভীরে ধারণ করে যে তা নিজের কালেই শেষ হয় না। যুগ-যুগ ধরে তাকে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ও মনন দিয়ে। যতবার দেখা হয় নিবিড়ভাবে ততবার নতুন নতুন বক্তব্য নিয়ে তা উপস্থিত হয়। তাই আজও আদি-মধ্য ও আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ যথার্থ সাহিত্যকীর্তিগুলো বারবার আমাদের সম্মুখে নবাবিষ্কারের পথ প্রশস্ত করে দেয়। আর আমরাও জিজ্ঞাসাপ্রবণ ধ্যান-জ্ঞান ও মননে নিবিড় অধ্যয়নে করে চলি নিত্যনতুনের অনুসন্ধান।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভের বিষয় 'বহুখণ্ডে বিন্যস্ত আত্মজৈবনিক উপাদানসম্পন্ন উপন্যাস : সমাজতাত্ত্বিক ও নান্দনিক বিশ্লেষণ'। আত্মজৈবনিক উপন্যাসে প্রথমতই এর শৈলীগত বৈচিত্র ও বিষয়বিন্যাস আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিষয়বিন্যাসের উপর নির্ভর করেই উপন্যাস রচনায় শৈলীগত বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয় লেখকের উপস্থাপন প্রণালীর স্বতন্ত্রতায় ও যথার্থতায়। এই ধরনের উপন্যাসের প্রধান ধর্ম হল, এগুলো বহুখণ্ডে বিন্যস্ত বা multivolumed হয়। এটা লেখকের সমগ্র জীবন অভিজ্ঞতার নিষ্কর্ষিত তাৎপর্যের বয়ান। তাই বিস্তৃত সময়ের ব্যবধান রক্ষা করতে, মূল ভাবের সঙ্গে পরবর্তী ভাবকে সম্প্রসারিত করতেই খণ্ডে

খণ্ডে বিন্যস্ত ধর্ম প্রযোজ্য হয়ে পড়ে। আত্মজৈবনিক এই অর্থে যে, উপন্যাসগুলোতে পরিলক্ষিত হয় লেখকের জীবনের কিছু কিছু উপকরণ এবং বিশেষ মুহূর্ত। অন্যদিকে শৈল্পিক মূল্যবোধে বাস্তব ও কল্পনার গ্রহণ-বর্জন-সংযোজনের প্রক্রিয়ায় বা মেলবন্ধনে ঘটে উপন্যাসীকরণ বা novelisation। সচেতন শিল্পীরা যেহেতু উদ্দেশ্যনিহিত ভাবেই আত্মজীবনের উপকরণকে আধার করে উপন্যাস রচনা করেছেন, তাই উপন্যাসগুলো ব্যক্তিজীবনের গণ্ডি অতিক্রম করে সামগ্রিক মানবজীবনের প্রতিচ্ছবিও হয়ে উঠেছে। আত্মজীবনী বা আত্মজৈবনিক উপন্যাসে রচয়িতার একটি 'সত্য' প্রকাশের অভিপ্রায় লক্ষ করা যায়। এই সত্য তাঁর সত্তা সম্পর্কে, চৈতন্য সম্পর্কে এবং মানব-জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত জগৎ ও বস্তুবিশ্ব সম্পর্কেও একটি গভীর দর্শন ব্যক্ত করে। যে-কোনো সাহিত্যেই পাঠক একটি সত্য আশা করে। কিন্তু আত্মজীবন বা এই ভাব সম্পর্কিত লেখায় বিশেষ উচ্চতর একটা তথ্যনির্ভর বাস্তব পটভূমি অবধারিত থাকে। তাই এটা বিশেষ একটা সত্যের মর্যাদাও পায় বটে। আর বিশেষ এই তথ্যনির্ভর সত্যে শৈল্পিক মূল্যবোধে লেখকের মনোভূমিতে কল্পনার রসে জারিত হয়ে যায় শৈল্পিক সত্যের প্রতিষ্ঠা। যা হাজার শঙ্কা ও সংশয় সত্ত্বেও পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। এখানেই প্রতিফলিত হয় সাহিত্যের নান্দনিক সুষমা।

এই অভিসন্দর্ভে আলোচিত হয়েছে নির্বাচিত তিনজন ঔপন্যাসিকের নির্বাচিত ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন। যথাক্রমে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কীর্তি রূপে অভিহিত 'শ্রীকান্ত', গোপাল হালদারের 'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন' একত্রে 'ত্রিদিবা' এবং ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ত্রয়ী 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত', 'মোহানা'। প্রতিপাদ্য বিষয়টির ধারাবাহিক আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, উপন্যাসগুলিতে রচয়িতাদের জীবনের কিছুটা ছায়াপাত পরিলক্ষিত হয়। যেহেতু এই রচনাগুলো রচয়িতাদের আত্মজীবনী নয়, বরং আত্মজৈবনিক উপাদানে সমৃদ্ধ ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন তাই এখানে তাঁদের সরাসরি প্রকাশ্য উপস্থিতি ধরা পড়ে না। যা পাঠক অবলোকন করেন, তা তাঁদের জীবনদর্শন, ব্যক্তিত্ব এবং ব্যবহারিক আচরণবিধির স্ফুরণ। অর্থাৎ এখানে আভাসে, ইঙ্গিতে লেখকদের জীবনের বিশেষ কিছু মুহূর্ত উপকরণ রূপে ধরা যায়। আর এই উপকরণগুলোতে লক্ষিত হয় লেখকদের জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনার কিছুটা সময়োপযোগী নির্যাস। উপন্যাসের সংস্থাপিত চরিত্রের ছায়াঞ্চলে লেখকদেরই প্রতিচ্ছায়ায় প্রতিভাত জীবনছবি। প্রাথমিকভাবে আমরা ধরে নিই যে উপন্যাস বাস্তব জীবনের মানুষের ঘাত-সংঘাতের প্রতিচ্ছবি। এই উপন্যাসগুলোতে কিছু মুখ্য, কিছু গৌণ চরিত্রের সমাহার লক্ষ করা যায়। এগুলোও লেখকের জীবনদর্শনের

বাস্তব পটভূমিনির্ভর পর্যবেক্ষণমূলক রচনা। কিন্তু যখন উপন্যাসের বর্গগত বিভাজনে 'আত্মজৈবনিক উপন্যাস' বা আত্মজৈবনিক উপাদানমূলক উপন্যাসের একটি বিভাগে তাকে অভিহিত করি। তাতে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ও লেখকের একটা উচ্চতর 'সত্য' প্রকাশের অভিপ্রায় লক্ষ করা যায়। এবং লেখার পেছনে লেখকের একটি বিশেষ motive বা উদ্দেশ্য কাজ করে। প্রত্যেক লেখার পেছনেই একটি motive বা উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু উদ্দেশ্যে অবলোকন করা যায় লেখকের বিস্তৃত জীবনের আহৃত তাৎপর্যে ভাল-মন্দ ও শুভাশুভ বোধ প্রকাশ ও অতীত জীবনকে ফিরে দেখার প্রবণতায় তিনি রচনার মধ্যে নিজেকেই নতুন রূপে নির্মাণ করছেন। এই নির্মাণের জন্য তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব, চিন্তাচেতনা ও বিগত জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনার কিছু বিশেষ মুহূর্ত, বিস্তৃত জীবনদর্শনে আহৃত অনুভূতি দিয়ে নিজস্ব একটা বিষয়ী সত্তা নির্মাণ করে থাকেন এবং এই সত্তার উপর নির্ভর করেই তাঁর চৈতন্য সম্পর্কে, জীবন সম্পর্কে একটি বিন্যাস পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়। আত্মজৈবনিক উপাদানে সমৃদ্ধ উপন্যাসকে একটি সাহিত্যিক Genre (শ্রেণি) রূপেই দেখা হয়। কারণ এটা বিষয়বিন্যাসে, শৈলীগত বৈচিত্রে নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ও ধর্মে স্বতন্ত্রতা অর্জন করে। এই ধরনের রচনায় লেখককে একটা সুনির্দিষ্ট বিন্যস্ত কাঠামো (elaborate structure) তৈরি করে নিতে হয়। কারণ আত্মজীবনীর মতোই লেখক জীবনের অপরাহ্নে বিস্তৃত জীবনকে আরেকবার ফিরে দেখছেন। তখন অনেক দিন পর নিজের জীবনে অতীতে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা, এবং তাঁর আশেপাশের বিষয়গুলো লেখকের স্মৃতিতে উদ্ভাসিত হচ্ছে। এবং বর্তমান সময়ে বসে যখন এগুলোকে নিয়ে ভাবছেন, তখন সময়ের ও অভিজ্ঞতার দ্রষ্টাচক্ষুতে তাঁর কাছে হয়তো গৌণ ঘটনা মুখ্য এবং সে-সময়ের মুখ্য ঘটনা গৌণ রূপে ধরা দিচ্ছে। যে-ঘটনাগুলোকে তিনি নিজের বয়ানে নিয়ে আসছেন সেগুলোর এলোমেলো ভাবকে সুনির্দিষ্টতা দিতেই বিন্যস্ত একটি কাঠামো তৈরি হতে দেখা যায়। এটাকে তত্ত্বগতভাবে বলা হয় 'retrospective awareness' অর্থাৎ বিগত কালের অনুভব সম্পর্কিত সক্রিয় সচেতনতা। আর এই 'retrospective awareness'টা আত্মজীবনী এবং ঔপন্যাসিক প্রক্রিয়ায় (Novelisation) সংগঠিত আত্মজৈবনিক উপাদান সমৃদ্ধ উপন্যাসে খুব সুন্দরভাবেই স্পষ্ট হয়। আত্মজীবনী বা আত্মজীবননির্ভর উপকরণে রচিত লেখায় লেখকের একটা 'self awareness' অর্থাৎ আত্মসচেতনতা বোধ থাকে। আর এই আত্মসচেতনতার ফলেই লেখক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিষয় নির্বাচন, মুখ্য ও গৌণ সম্পর্কের মধ্যে বিন্যাস গড়ে তুলতে সক্ষম হন। যার ফলে সবকিছুতে স্পষ্ট হয় ভাঙাগড়ার বিনির্মিত প্রয়াস। বিনির্মাণের মাধ্যমেই লেখক পাল্টে দেন

নিজের অবস্থানগত বিন্যাস, বিষয়ের কালগত পরিমণ্ডলকে। শিল্পের খাতিরে ভাঙা-গড়ার মাধ্যমে বিন্যস্ত কাঠামোর ও বিনির্মাণের স্বাধীনতাটুকু লেখকের থাকতেই পারে। শৈল্পিক স্বাধীনতার ফলে বিনির্মাণের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক প্রক্রিয়ায় আত্মজীবনের উপকরণ ও উপন্যাসকে যুগ্মভাবে এভাবেই লেখক নিজস্ব বিষয়ের পরিমণ্ডলে একটা নতুন কাঠামোতে বিন্যস্ত করে নেন। যেখানে সংস্থাপিত মুখ্য চরিত্রের প্রতিচ্ছায়ায় নিজস্ব আত্মগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি এবং কিছু অন্যান্য চরিত্র অবলম্বন করে নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-আততি সংশ্লেষণের ভিত্তিতে সামগ্রিক জনজীবনের ছবি প্রস্ফুটিত করে।

আত্মজীবনের উপকরণ এবং রচনাপদ্ধতিতে আত্মজীবনীর মতোই রীতি-কৌশলের কিছুটা শর্ত অবলম্বন করেই আত্মজৈবনিক উপাদান সম্পন্ন উপন্যাসের বিষয়ভিত্তিক বর্গকরণের পথটি প্রশস্ত হয়। ফলে অন্যান্য বিষয়ে রচনা পদ্ধতিতে আত্মজীবনীর মতো অতীত জীবনকে ফিরে দেখার স্মৃতি রোমন্থনের পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয় এবং লেখকের বিস্তৃত জীবন পরিক্রমা, অভিজ্ঞতা, দৃষ্টান্তও অবলোকন করা যায়। আর এই ধরনের উপন্যাসে লেখক প্রতিসত্তা রূপে একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র সংস্থাপন করে নেন নিজের বক্তব্য প্রসারিত করার প্রয়োজনে। যেহেতু এটা ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন তাই কেন্দ্রীয় চরিত্রের পরিমণ্ডলে আরও অন্যান্য কিছুটা মুখ্য কিছুটা গৌণ চরিত্রের সমাবেশও ঘটে। এই ধরনের রচনার ফলে একের মধ্যে দুটি বিষয় প্রত্যক্ষ করা যায়। একদিকে আত্মজীবনের উপকরণসমূহে লেখকের ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিত্বকে অনুভব করি। আভাসে, ইঙ্গিতে কিছুটা তাঁদের চারিত্রিক প্রকৃতি ও দৃষ্টিগোচর হয় সৃষ্ট চরিত্রের ছায়াঞ্চলে। অন্যদিকে বিস্তৃত কাল, পরিমণ্ডলকে গ্রহণ করায় তাঁদের বিস্তৃত জীবনদর্শনের দার্শনিক পটভূমিকায় সামাজিক বহুস্বর গুঞ্জিত হয় ঔপন্যাসিক প্রক্রিয়ায়। এই প্রক্রিয়ায় সংগঠিত হয় গ্রহণ-বর্জন-সংযোজনের একটি পরিশীলিত শৈল্পিক রূপ। আর আত্মজীবনের উপাদানকে কেন্দ্র করে এই প্রক্রিয়ায় পরিলক্ষিত হয় উপন্যাস শিল্পের স্বাতন্ত্র্য।

বিষয়ভিত্তিক বিভাজনে এই ধরনের উপন্যাসে বিস্তৃত আলোচনায় লক্ষ করেছি এর তিনটি মূল শর্ত। অর্থাৎ লেখকের আত্ম-সচেতনতা, এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের সচেতন প্রকাশ ও রচনায় তাঁর উদ্দেশ্যনিহিত বক্তব্যের প্রতি সচেতনতা। নির্বাচিত উপন্যাসগুলোতে তিনটি মুখ্য চরিত্র ভবঘুরে শ্রীকান্ত, রাজনীতি সচেতন অমিত এবং বুদ্ধিবাদী খগেনবাবুর ব্যক্তিত্ব মূলত লেখকদেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে। শ্রীকান্তে চরিত্র শ্রীকান্তের প্রকৃতি ও চরিত্রে লেখক শরৎচন্দ্রেরই জীবনের অভিব্যক্তি ঘটেছে। তাঁর শৈশব এবং

উল্লিখিত বিভিন্ন জায়গার বর্ণনায় রয়েছে শরৎচন্দ্রের জীবনের বাস্তব ও নিবিড় সম্পর্ক। কিন্তু যেহেতু এটা ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন তাই নিজের বক্তব্যকে ব্যক্ত করতে গিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে। এবং শৈল্পিক শর্তে লেখকরূপে খুব সন্তর্পণে জীবনে উপলব্ধ তাৎপর্যকে আধার করে অন্যান্য চরিত্র ও জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে নিজেকে আড়ালও করেছেন। অর্থাৎ সমাজ সচেতন, নারীদরদী, দরিদ্রদের সমব্যথী হৃদয়সম্পন্ন লেখক সমস্ত জীবনব্যাপী আহৃত সমাজের ব্যভিচারকে এবং বিশেষভাবে নিম্নশ্রেণির ও নারীর লাঞ্ছিত জীবনকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছিলেন।

রাজনীতি সচেতন গোপাল হালদার। যিনি মুক্ত চিন্তাবিদ, স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাই ত্রিশের দশকের উত্তাল বিভীষিকাময় বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব থেকে স্বাধীন ভারত পর্যন্ত সময়কে স্বাক্ষর রাখার উদ্দেশ্যেই 'ত্রিদিবা'র রচনা। আর ত্রিদিবায় খুব সচেতনভাবেই তিনি রাজনীতি-সচেতন অমিত চরিত্রে নিজের ব্যক্তিসত্তার এবং পর্যবেক্ষণ মূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে ছোট-বড়, মুখ্য-গৌণ সব নেতৃত্বের সংগ্রামী ও বিপ্লবী জীবনকেও প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর বয়ানে ব্যক্ত হয়েছে উদ্দেশ্যনিহিত ত্রিশের দশকের উত্তাল সংগ্রামী জীবন ও সময়ের অভিব্যক্তি।

অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহানায় ধূর্জটিপ্রসাদের সৃষ্ট খগেনবাবু চরিত্রে ঘটেছে তাঁর বৌদ্ধিক সত্তারই প্রকাশ। লেখকের মূল শৈল্পিক অভিপ্রায়টিই ছিল এখানে ত্রিশের দশকের একজন বুদ্ধিজীবীর মানসিক অভিব্যক্তি দেখানো। যার প্রথম এবং প্রধান প্রতিক্রিয়াই হল ভাবের রাজ্য থেকে পলায়ন। কিন্তু প্রখর সচেতন বুদ্ধিবাদীর পক্ষে পলায়ন অসম্ভব। কারণ তিনি আত্মসচেতন হয়েও মূলত সমাজ-সচেতন, সমাজ সচেতনতার ফলে তার মধ্যে সামগ্রিকতার বোধও প্রখর হয়। ফলে তিনি ব্যক্তি হিসাবে স্বতন্ত্র হয়েও সামাজিক অন্বয়ে নিজেকে সংযোগী সত্তা রূপেই অবলোকন করেন। ফলে সমস্ত তিনখণ্ড উপন্যাস জুড়ে পলায়নবাদী বৌদ্ধিক সত্তার ক্রমবিবর্তন ঘটেছে শ্রেণিচেতনায়। যিনি বৌদ্ধিক সত্তা, যার মধ্যে আত্মসচেতনতা ও সমাজ-সচেতনতার বোধ প্রখর, তিনি কখনও জনস্বার্থের কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেন না।

এই উপন্যাসগুলোতে আরও লক্ষ করা যায়, প্রত্যেক চরিত্রের অভিব্যক্তিতে ঘটেছে নানা দ্বিধা, মানসিক সংঘাত অতিক্রম করে 'ছোট আমি' থেকে 'বড় আমি'তে উত্তরণ। অর্থাৎ প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই লক্ষ করি তারা ব্যক্তিক জীবন অতিক্রম করে সংযোগী-সমবায়ী সামাজিক সত্তারূপেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন

শেষপর্যন্ত। ফলে বাখতিন কথিত উপন্যাসের প্রধান ধর্ম ও শর্তটি অর্থাৎ সত্তা ও অপরতার দ্বিবাচনিক দিকটিও সার্থকতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে উপন্যাসগুলোতে। আর এই উপন্যাসগুলোতে আত্মজীবনীর সন্দর্ভের বৈশিষ্ট্য, ধর্ম ও রীতি-কৌশলের অবলম্বন এবং ঔপন্যাসিক প্রক্রিয়ার শৈল্পিক মেলবন্ধনটি লক্ষ করা যায়।

দৃষ্টিভঙ্গির বহুমাত্রিকতায় এবং জিজ্ঞাসায় প্রতিনিয়ত চলছে সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন নতুন অনুসন্ধান। যার ফলস্বরূপ একটা প্রতিবেদন বা সচেতন লেখকের কোনো সৃষ্টিসম্ভার নিরন্তর নতুন নতুন ভাব ও দিক উন্মোচন করে চলে। এটা সম্ভব হয় মননশীল লেখক ও পাঠকের নিবিড় দ্বিরালাপে। একটা বিষয় থেকেই পাঠকের অনুভব, দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখকের সৃষ্টি পেয়ে যায় বিভিন্ন মাত্রা। তাই কোনো সিদ্ধান্তই শেষ সিদ্ধান্ত হতে পারে না। আমরা নিবিড় পাঠের মধ্য দিয়ে একটা আপাত মীমাংসায় পৌঁছাই মাত্র। প্রতিটি আপাত সমাপ্তিই যেন পরবর্তী পাঠের সূচনা-মুহূর্ত তৈরি করে। এই অভিসন্দর্ভে আত্মজৈবনিক উপন্যাসকে কেন্দ্র করে, তার স্বরূপ সন্ধানের পথে ধারাবাহিকভাবে একটা যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। তা বিচার-বিশ্লেষণে একটা আপাত-সমাপ্তিতে পৌঁছেছে। আত্মজৈবনিক উপন্যাসের স্বরূপে পরিলক্ষিত হয়েছে বিষয়বিন্যাসের নিজস্ব একটা বর্গীকরণ তার আধার ও উপকরণে।

পরিশেষে বলা যায় যে, লেখকের বিস্তৃত জীবনের অভিজ্ঞতা, তাৎপর্য, জীবন উৎকর্ষ এবং জীবনদর্শনের একটি বিশেষ আভিপ্রায়িক সত্যই আত্মজীবনের আধারে রচিত উপন্যাসে প্রতিষ্ঠা পায়। এবং এই ধরনের উপন্যাস স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে, গুণগত ধর্মে, শৈলীগত বৈচিত্রেও স্বতন্ত্রতা লাভ করে। আর বিস্তৃত সময়-পরিসরের অভিজ্ঞতায় ও নৈতিক মূল্যবোধে, লেখকের আত্মনিরীক্ষণে জীবন, সমাজ ও জগৎ পরীক্ষিত হয়েই নিজস্ব একটি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিষয়টিই স্পষ্ট করতে চেয়েছি আলোচ্য অভিসন্দর্ভের ধারাবাহিক অনুসন্ধানমূলক জিজ্ঞাসায়। নিবিড় অধ্যয়নের আপাত সমাপ্তিতে এই আশাই ব্যক্ত করছি যে এই প্রতিবেদন সম্ভাব্য কোনো পরবর্তী বয়ানের সূচনাবিন্দু হিসেবে বিবেচিত হবে।